২৭-১২-১৭ : প্রাতঃমুরলী
ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে তিন বাবার রহস্য সবাইকে জানাও। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বেহদের এই বাবাকে সঠিক ভাবে জেনে পবিত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না

প্রশ্ন :- একেবারেই নতুন এই বাবা। উনি ওনার নিজের কি এমন নতুন পরিচয় দিচ্ছেন তোমাদেরকে ?

উত্তর :- মানুষেরা তো বলে থাকে, বাবা হাজার সূর্যের চাইতেও তেজময়, কিন্তু বাবা স্বয়ং বলেন, উনি তো সামান্য বিন্দু-স্বরূপ মাত্র। এই হিসাবে এটা তো বাবার নতুন স্বরূপ। শুরুতেই যদি সেই বিন্দুরূপের সাক্ষ্যাৎকার হয়, তবে তো কেউ তাকে মানতেই চাইতো না। এই কারণেই যার মনে যেমন ভাবনা আসে, তেমনই সাক্ষ্যাৎকার হয়ে থাকে তার।

গীত :- ওঁম্ মনঃ শিবায়ঃ .....

ওঁম্ শান্তি! নিরাকার ভগবানউবাচঃ - কেবলমাত্র ভগবানউবাচঃ বললে তখন কৃষ্ণের নাম মনে পড়ে যায়। যেহেতু আজকাল সবাই তাকেই ভগবান বলে জানে। তাই এভাবে বলা হয়ে থাকে, নিরাকার শিব ভগবানউবাচঃ। তাকেই প্রকৃত গড়-ফাদার বলা হয়। আচ্ছা, তবে নিরাকার ভগবানউবাচঃ কাকে বলা হবে ? -নিরাকার বাচ্চাদের অর্থাৎ রুহুদের প্রতি। রুহানী ভগবানউবাচঃ বা ঈশ্বর-উবাচঃ এই সম্ভাষণ তো আর শোভা পায় না। তাই নিরাকার ভগবানউবাচঃ এটাই হলো উপযুক্ত সম্বোধন। কিন্তু তাই বলে বারে বারে তো আর তা বলবেন না। যেহেতু উনি হলেন খুবই গুপ্ত-স্বরূপ। যার কোনও চিত্রও হয় না। আবার কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি বিন্দু এঁকে সেখানে যদি ভগবাববাচঃ লেখা হয়, তাতেও লোকেরা মানবে না। ভগবানের যথার্থ নাম, রূপ, দেশ, কাল, ইত্যাদি কেউ-ই জানে না যেখানে। এছাড়া আত্মারা যদি তাদের প্রকৃত বাবাকে জানতে পারে, তবে তো রচনার রহস্যকেও জেনে যাবে। কিন্তু এই না জানাটাও ঘটে থাকে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই। যা বহু পূর্বেই তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তাই তো আবারও বাবাকে এসেই তার নিজের পরিচয় নিজেকেই জানাতে হয়। বাবা জানাচ্ছেন- সময় অনুসারে ওনার এই পার্ট, যা পতিতদের পবিত্র বানাবার, তা ওনাকেই করতে হয়। আর তখনই উনি এসে ওনার পরিচয় জানান। আর এই প্রক্রিয়ায় পুরোনো দুনিয়াকেও নতুন দুনিয়া বানিয়ে দেন। এই কারণেই পুরোনো দুনিয়ার মানুষেরা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত পবিত্র মানুষদের পূজা-অর্চনাও করে। বাবা বাচ্চাদের আরও জানাচ্ছেন, এসব তথ্যগুলি যুক্তিসহকারে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রশ্ন আসতে পারে, যেখানে ঋষি-মুনিরাও স্বীকার করেন যে, তারা রচয়িতা ও রচনাকে জানতে পারে না, সেখানে তোমরা বি.কে.-রা তা জানলে কিভাবে ? আর সত্যিই যদি তোমারা বি.কে.-রা সেই রচয়িতা বাবাকে আর তার রচনাকে জেনেই থাকো, তবে সেই জ্ঞান শোনাও আমাদের। তারা (মুনী-ঋষিরা) যেমন সেই জ্ঞান কারওকে জানাতেই পারে না, না পরে কোনও প্রকার আশীর্বাদী বর্সা দিতে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো সেই অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো তোমাদের একান্ত আপন নিরাকারী বাবার থেকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো, বেহদের বাবা এখন এসেছেন এই দুনিয়ায়, নতুন দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদী-বর্সা দিতে অথবা সুখ দিতে। তবে তো অবশ্যই তোমাদের এই দুঃখের দুনিয়ার পরি-সমাপ্তি ঘটবে। নতুন সেই দুনিয়া হবে সুখধাম, যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া কেবলই দুঃখধাম। অতএব এবার এই দুঃখধামের বিনাশ অবসম্ভাবী। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়াও একদা নতুন দুনিয়াই ছিল, যা এখন অতি পুরোনো হয়ে গেছে। এই দুনিয়াই আবার নতুন দুনিয়ায় পরিণত হবে। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় সত্যযুগ আর পুরোনো দুনিয়াকে কলিযুগ। নতুন দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই থাকে। সত্যযুগে কেবলমাত্র একটাই ধর্ম থাকে। যা বর্তমানে এত অনেক ধর্মের সমাবেশ, তাই দুঃখও এত বেশী। সুখ থেকে দুঃখ - আবার দুঃখ থেকে সুখ। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নাটকের এই খেলা এমন ভাবেই তৈরী হয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই দুঃখ দেন কে, এটাই কারও জানা নেই। -- অবশ্যই রাবণ, যাকে আবার মায়া-ও বলা হয়। ধন-সম্পদকে মায়া বলা চলে

না। বিকারী মানুষেরাও জানে দেবতারা নির্বিকারী। কিন্তু লোকেদের সংস্কার যে বিকারের নেশায় মত্ত হয়ে আছে, আর দেবতারা থাকেন নির্বিকারী নেশায়। দেবতারা মোটেই অপবিত্র হয় না। পবিত্রতা কি, তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.দেরকে তা বোঝানোও হয়, যা একমাত্র এই সঙ্গম সময় কালেই। তোমাদেরকেও আবার তা অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। একমাত্র এই বাবা তো আর সমগ্র দুনিয়াকে তা বোঝাতে পারবে না। বাচ্চাদেরকেই তা বোঝাতে হবে। কিন্তু তা আবার যথেষ্ট যুক্তি-গ্রাহ্য হিসেব তৈরী করে নিয়ে অন্যদেরকে তা বোঝাতে হবে। সবাইকে অবশ্যই জানাতে হবে, এই ভারত-ভূমি যখন নতুন ছিল, তখন তা ছিল স্বর্গ-রাজ্য। যা বর্তমানে অতি পুরোনো হয়ে গেছে। যার রচয়িতা স্বয়ং এই বাবা। উনি স্বয়ং বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন, উনি ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা-কার্য করান। উনি-ই বি.কে.দেরকে দত্তক নিয়ে নিজের বাচ্চা হিসাবে স্বীকার করেন আর ব্রহ্মাকে করেন প্রজাপিতা। ব্রহ্মার মাধ্যমে দত্তক নিয়ে এভাবে এত বিশাল সংখ্যক সন্তান ওনার। যেমন সন্ন্যাসীরা তার অনুগামীদের দত্তক নিয়ে থাকে। স্বামী যেমন তার স্ত্রীকে দত্তক নিয়ে বলে যে, এখন থেকে তুমি আমার হলে। এখানেও তেমনি তোমরা বাবাকে (আমাকে) বলো- শিববাবা, আমি তো তোমারই। ঘরে বসেই এমন অনেকের টাচ্ (সাক্ষ্যাৎকার) হয়ে যায়। তাদেরকে তখন আর কি বা বলা যায় ? যেমন - "বাবা, যদিও অদ্যাপি আপনাকে চাক্ষুস দেখিনি, যেহেতু সাংসারিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি, এখানে আসার অবসর বা সুযোগটুকুও পর্যন্ত পাই না, কিন্তু আমি যে মনে-প্রাণে আপনারই। তাই আমাকেও পবিত্র হতে হবে অবশ্যই।" পতিতেরা মুক্তি বা জীবন-মুক্তিতে যেতে পারে না। তাই তো পতিতেরা বাবাকে ডাকতে থাকে, "বাবা এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও।"

"বাচ্চারা, অন্যদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই ভারত ভূমিই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, এরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। তাদেরও নিশ্চয় একটা রাজত্ব-কাল চলেছিল অবশ্যই। যেটা ছিল নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য। যা এখন আর নেই। যেমন এখন এত ধর্ম, অথচ দেবতা ধর্মই নেই। বর্তমানের এই এত পুরোনো দুনিয়া, তা আর ক'দিনই বা চলবে ? লোকেরা তো সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর বলে। মহাযুদ্ধের এই লড়াইয়ের কাহিনীরও কত প্রচলিত মুখোরোচক বাক্যও আছে। যেমন দুপক্ষের মধ্যে কোনও প্রকার ঝামেলা হলেই, উদাহরণ হিসাবে তখন অন্যেরা বলে, এটা যে মহাভারতের লড়াই-এর সময়। কাহিনীতেও আছে যাদবরা নিজেদের মধ্যে লড়াইতে (মুসল-পর্বে) মিসাইল দ্বারা এক-পক্ষ কিভাবে অন্য-পক্ষকে বিনাশ করেছিলো। কোথাও কোথাও লেখা আছে, পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ, কোথাও বা লেখা আছে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ। আসুরী দুনিয়ার বিনাশের সাথে সাথেই অনতিবিলম্বেই দৈবী দুনিয়া শুরু হয়ে যায়। ওগুলি সব হলো পতিত দুনিয়ার আর দৈবী দুনিয়া হলো পবিত্র দুনিয়া। তবে সেক্ষেত্রে পবিত্র দুনিয়ার দেবতারা অসুরদের সাথে লড়বেই বা কি প্রকারে ? দুটো যুগের অবস্থানের সময়কালেও যে বিস্তর তফাৎ। দেবতারা সত্যযুগের আর অসুরেরা কলিযুগের। অতএব এই দুই-পক্ষের লড়াই বাস্তবে মোটেই সম্ভব নয়। এছাড়াও দেবতারা যে অহিংসক আর অসুরেরা হিংসক। অসুরদের নরকে দেবতারা আসবেই বা কি প্রকারে ? বাচ্চারা, তোমাদের অবস্থান এখন সঙ্গমযুগে। ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজ চলতে থাকে। যার জন্য তোমরাই সেই পুরুষার্থ করে চলেছো। দুই-বাবার রহস্যটাকে গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে হবে। সত্যযুগে কিন্তু কেবলমাত্র একজন বাবা থাকে। কারণ, তখন কারও বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হয় না, যেহেতু সেটা সুখধাম। দ্বাপরযুগ থেকেই দুই বাবার অস্তিত্ব শুরু হয়। তখন যেমন তারা তাদের লৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, তেমনি পারলৌকিক বাবাকেও স্মরণ করতে থাকে তারা। অর্থাৎ আত্মাই তার বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। যেহেতু তখন থেকেই আত্মা দুঃখ-কষ্ট সইতে থাকে। এই আত্মাই পুণ্যাত্মা হয়, আবার পাপাত্মাও হয়। এই আত্মাই সব কিছু শোনে ও বোঝে। সংস্কারগুলির কু এবং সুগুলিও এই আত্মাই ধারণ করে। যার মধ্যে দৈবী সংস্কারের অভাব থাকে, সে দৈবী সংস্কারধারীদের গুণ-কীর্তন করে। তাই তো এমনটা বলা হয়ে থাকে, যে ছিল পূজ্য - সে নিজেই হয় পূজারী। গুণ-শক্তি হারিয়ে,পূজারী-স্বরূপে, নিজেরাই তখন বলতে থাকো - "আমি তো গুণ-হারা এক আত্মা ..... দেবতা অবস্থায় যে গুণ-শক্তি ছিল, তা আজ আর নাই।" এখন যারা পূজারী হয়েছে - তারাই একদা পূজ্য ছিলে। অর্থাৎ তোমরা যারা পূজ্য ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন সেই তোমরাই পূজারী। নিয়মটাই এমন যে, কল্প শুরুর অর্দ্ধ-কল্প পূজ্য, আর শেষের অর্দ্ধ-কল্প পূজারী। এইভাবে হিসেব বোঝাতে হবে। আরও বোঝাতে হবে, দেবতা-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের বিষয়টাও ..... আর এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কেবলমাত্র বি.কে.-রা, যারা এখন দুনিয়া পরিবর্তণের কার্যে নিয়োজিত।

বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে তোমাদের সবারই তিন বাবা। সাকারী লৌকিক বাবা, নিরাকারী পারলৌকিক বাবা আর তৃতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এই ব্রহ্মার দ্বারাই তোমদের অর্থাৎ বি.কে. দের জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে ব্রাহ্মণ

বানানো হয়। প্রজাপিতা নামের সাথে তোমাদের পরিচয় তো অবশ্যই আছে। যেহেতু ব্রহ্মার দ্বারাই প্রজার রচনা হয়ে থাকে। তাই তোমরাও এখন ব্রাহ্মণ। অতএব অবশ্যই তোমরা তোমাদের (শিব) বাবাকে নিয়মিত স্মরণ করবে। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন, উনি তো এসেছেন, তোমাদের স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নিরাকার পরমাত্মাই আত্মাদের জানান এসব কথা। অবশ্য তোমরা নিজেরাও তা বলে থাকো, *এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে অবস্থান নেয় এই আত্মাই। তখন কেবলমাত্র শরীরের নাম-রূপের বদল ঘটে। আত্মা কিন্তু একই থাকে। যেমন আত্মাদের পিতা পরমাত্মার যে নাম 'শিব', তাও সর্বদা একই থাকে। পরমাত্মা শিবের কোনও শরীর থাকে না* এই পয়েন্টটাকে অবশ্যই মনে রেখে অন্যদেরকে তেমন ভাবেই বোঝাতে হবে, যারা যেমন তোমার সামনে আসবে। তাদেরকে এও জানাতে হবে, তোমরা বি.কে.-রা, তোমাদের দাদুর কাছ থেকেই অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। উঁনি একাধারে যেমন রাজযোগের শিক্ষা দেন, তেমনি আবার জ্ঞানের পাঠও পড়ান। এই পাঠের মূল কথাই হলো, কি ভাবে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। আর এই জ্ঞান পাওয়া যায় কেমলমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গম-যুগেই। এই জ্ঞানের সাহায্যেই নতুন দুনিয়ায় পৌঁছবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। শিববাবা এই পতিত দুনিয়ায় এসে দুনিয়াকে পবিত্র করার জ্ঞান ও যোগ শিখিয়ে সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা স্বয়ং এখন এই সময়ে ধরায় এসেছেন, তার বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ড্রামা অনুসারে সবাইকেই (আত্মদের) ঘরে ফিরে যেতে হয়। এরপর একে একে প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী ও শূদ্রবংশীরা এসে যুক্ত হতে থাকে এই নাটকে। পরমধামেই থাকে নিরাকার আত্মাদের ঝাড়-বৃক্ষ। আর এখানে থাকে সাকারী মানুষদের ঝাড়-বৃক্ষ। এতে থাকে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ঝাড় বা ডাল-পালা। যার সম্পূর্ণতার বিভিন্নতা হলো। বিরাট-রূপ। বর্তমানে এই সময়কালে ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু রুদ্র-মালা এবং বিষ্ণু-মালা তৈরী হবার আছে। ব্রহ্মার কোনও মালা তৈরী হয় না কিন্তু। যেহেতু ব্রাহ্মণদের পুরুষার্থের নামা-ওঠা চলতে থাকে। তাই তারা উপযুক্ত হয়ে রুদ্র-মালায় স্থান পায়, ফলে পূজিতও হয়। এমন অনেক নতুন নতুন পয়েন্টও আছে। জাগতিক বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিতেও এসব ধারণা নেই মোটেই। তারা তো কল্পের আয়ুকেই লাখ-লাখ বছর বলে থাকে। তাই তো তোমাদের যুক্তিগুলি তাদের কাছে নতুন নতুন মনে হয়।

দুনিয়া যখন নতুন, তবে সেখানে অবশ্যই সব কিছু নতুনই হবে। বাস্তবে বাবাকেও তোমরা আবার নতুন রূপেই পাও। তাই তো লোকেরা বলে থাকে, নিরাকার পরমাত্মার না আছে নাম, না আছে কোনও রূপ। যিনি হাজার-হাজার তারার সমন্বয়ে অর্থাৎ হাজার-হাজার সূর্যের সম্মিলিত তেজের চাইতেও বেশী তেজময়। তাদের তেমন তেমন সাক্ষ্যাৎকারও হয়ে থাকে, যাদের যেমন ভাবনা। কিন্তু বিন্দুর কোনও সাক্ষ্যাৎকার যদি তাদের হয়, সে তো তারা মেনে নিতেই পারবে না। এসব তথ্য তাদের কাছে নতুন বলেই তারা ধন্ধে পড়ে যায়। যারা এখানকার অর্থাই বি.কে. (আগামীতে দেবতা-ধর্মের), কেবলমাত্র তাদেরই মধ্যেই নিড়ানী = স্যাপলিং (নামা-ওঠা) হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন খুব ভালভাবেই বুঝেছো যে, পারলৌকিক বাবার বিষয়ে কিভাবে বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। তোমরা বি.কে.-রাই অর্দ্ধ-কল্প ধরে এই বাবাকেই স্মরণ করে আসছো। যিনি সুখদাতা কেবলমাত্র তকেই তো স্মরণ করবে তোমরা। রাবণকে অবশ্যই নয়। যেহেতু, রাবণ যে তোমাদের সবারই শত্রু। তাই তো তোমরা প্রতি বছরই রাবণের পুত্তলিকা জ্বালিয়ে থাকো। লোকেদের কাছে যদি জানতে চাও, রাবণকে জ্বালাবার এই রীতি কবে থেকে শুরু হয়েছে, -তাদের উত্তর হবে, তা তো অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। আসলে তাদের এই ধারণাটাই নেই, কখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। সত্যযুগে তো রাবণের নাম-নিশানাও থাকে না। যদিও ভারতের সবচেয়ে পুরোনো শত্রু এই রাবণ। যার কাজই হলো আত্মাদের পতিত বানানো। তবে আত্মাদের প্রকৃত শত্রু কে হলো ? -- অবশ্যই রাবণ! সেই আত্মা আবার শরীরেই অবস্থান করে। সেই হিসেবে তবে শরীর ও আত্মা উভয়েরই শত্রু কে হলো ? -- (রাবণ)। তবে কি রাবণের কোনও আত্মা আছে ? রাবণ আবার কি বস্তু বা তার আকারই বা কি ? *-রাবণ অর্থাৎ বিকার। রাবণের মধ্যে কোনও আত্মা থাকে না। ৫-বিকারকে রাবণ বলা হয়। আত্মাতেই এই ৫-বিকার আসে।* তারই একটা পুত্তলিকা বানানো হয়। তোমরা তো জানোই, বর্তমান সময়টা খুবই দুঃখের, এর পরেই বাবা এসে সেই সুখের দিশায় অবশ্যই নিয়ে যাবেন। যেহেতু এক ও একমাত্র এই বাবা যে মোদের পতিত-পাবন বাবা। যেমন অন্য আত্মারা আসে, উনিও ঠিক তেমন ভাবেই আসেন। আত্মাকে শ্রাদ্ধ-ভোজ খাওয়াবার জন্য লোকেরা মন্ত্রাদির সাহায্যে মিনতিপূর্বক আহ্বান করে। ব্রাহ্মণকেই তারা তাদের সব দ্বায়িত্ব অর্পণ করে দেয়। তাদের বিশ্বাস আত্মা নিশ্চয় আসে এবং কথাও বলে। তবে পরমাত্মার আগমনের ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক ও চমকপ্রদ, যেহেতু ব্রহ্মাবাবার এই শরীর-রথ হলো স্বয়ং ঈশ্বরের। তাই ব্রহ্মাকে ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যবানের রথ বলা হয়। যা কোনও জলের নদীর ব্যাপার মোটেই নয়। যার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানের নদী। বাবা বুঝিয়ে বলছেন, উনি প্রবেশ করেন সাধারণের শরীরে এবং তার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। অথচ ওনাকে দত্তক নেওয়া হয়

না। উনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেই বি.কে.বাচ্চাদেরকে দত্তক নেন। তাই তোমরা যা কিছু বলো তা শিববাবাকেই বলো, -"বাবা আমরা তো তোমারই সন্তান।" তাই তোমাদের বুদ্ধির যোগ উপরের দিকেই যায়, কারণ বাবা স্বয়ং বলেন, ওনাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করতে থাকলেই আত্মার বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। সুতরাং এই যোগ-যাত্রায় ব্যস্ত রাখো নিজেকে। একথা মনে রেখো, এই ব্রহ্মাবাবা এদিক-ওদিক যেখানেই যাক না কেন, তোমরা কিন্তু একই ভাবে বসে থেকে শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। শিববাবাও এই ব্রহ্মারূপী রথে করে দিল্লী গিয়েছিলেন, কানপুরেও গিয়েছিলেন ..... তোমাদের মন-বুদ্ধিতে সর্বদা যেন শিববাবাই স্মরণে থাকে। নীচে অর্থাৎ এই জাগতিক যা কিছু তার মধ্যে নিজেকে আসক্ত রেখো না, তোমাদের মন-বুদ্ধি যেন উন্নত-মার্গে থাকে। আত্মা যেন লাগাতর পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকে। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার ধাম উঁচু থেকেও অনেক উঁচুতে। ওনার অবর্তমানে এখানে তোমরা যেন ভুল-ভুলাইয়াতে ফেঁসে যেও না। তোমরা যখন যেখানেই থাকবে, আমাকে সেখানেই স্মরণ করবে। তোমরা বি.কে. আত্মারা সেখানেও বাবার সাথেই থাকবে। এমনটা মোটেই নয়, বাবার থাকার জায়গা একটা আর তোমরা থাকবে অন্যত্র। তা যে কখনও হতেই পারে না, একথা মন-বুদ্ধিতে পাকা করে নাও। করাচীতে যেমন তোমাদের এক একজনকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝানো হতো, সেটাই বরং ভাল ছিল। কিন্তু যখন একত্রে তা করা হয়, তাতে একে অন্যের স্পন্দন সঠিক ভাবে স্থিত হয় না সবার কাছে। ভক্তিও তো একান্তেই বসেই করে। তেমনি এই জ্ঞানের পাঠও একান্তে নিরিবিলিতে করতে হয়। সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় জানাতে হবে অন্যদেরকে। তারপর জানাতে হবে, এক ও একমাত্র এই বাবাই পতিত-পাবন, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হতে পারছো।

বাবা বলছেন - "বাচ্চারা, তোমাদের এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে পারলে সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কত বিশাল এই প্রাপ্তি।" বাবা আবার বলছেন, "চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সব কিছুই করার সাথে সাথে আমাকেও লাগাতর স্মরণ করতে থাকো। আর পবিত্র হয়ে যোগবলের দ্বারা তোমাদের আত্মার ময়লাগুলিকে ভস্মে পরিণত করে তা বের করে দিতে হবে। তবেই তুমি সতোপ্রধান হতে পারবে। তখন তুমি একরস স্থিতি ও কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। আর মন-বুদ্ধিতে জ্ঞানের পয়েন্টগুলিকে মন্থন করতে থাকবে। পাত্র-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধ-সম্পর্কের যারা আছে, তাদেরকেও জ্ঞানের পয়েন্টগুলি বোঝাতে থাকো। কল্প-পূর্বেও তোমাদেরকে এভাবেই বোঝানো হয়েছিল। তাই এ কোনও নতুন কিছু নয় তোমাদের কাছে।" কল্পে-কল্পে, প্রতি কল্পেই বাবা স্বয়ং এসে ঠিক এভাবেই তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা আবার সেটাই জগতের অন্যদেরকে বোঝাও। প্রতি কল্পের শুরুতেই এই ভারতভূমিই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। গত কল্পেও তা ছিল আবার আগামী কল্পেও এই ভারতভূমিই স্বর্গ-রাজ্য হবে। ড্রামার পটচিত্র অবিরাম এই ভাবেই ঘুরতেই থাকে। এটাই তাদের বোধগম্য হয় না, লোকেরা সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর বলে কি হিসাবে। আদমসুমারীর লোক গননাতে সেই সংখ্যা এখন তবে তো লোকসংখ্যা অগুনিতক হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃত তথ্য হলো :- চার (৪) যুগ, প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। তোমরা যেভাবে যা জানলে-বুঝলে, তেমনি ভাবেই অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকবে। এইভাবেই বি.কে.-ব্রাহ্মণদের ডালপালা বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাচ্চাদের ভাগ্যে কখনও বা গ্রহের প্রকোপ বাড়ে আবার তা কেটেও যায়। বাবা জানাচ্ছেন, এসব বোঝানো খুবই সহজ। আসল কথা হলো আল্ফ আর বে অর্থাৎ পরমাত্মা আর আত্মা। যা বোঝানো খুবই সহজ। আর মূল কথা স্মরণের যাত্রা। যদিও তা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। যেহেতু এক কল্প বাদে এই স্মরণের যাত্রার অভ্যাস করতে হয়। যা একেবারেই গুপ্ত। এটাই খুব মুস্কিলের ব্যাপার। তোমরা যে আল্ফকে এতদিন ধরে ভুলে আছো, তাকেই স্মরণ করতে হয়। অন্যেরা কেউ সঠিক ভাবে ভগবানকেই তো চেনেও না, জানেও না। যদিও তার গুণগান কীর্তন করে -সদগুরু বিনা জীবন যে ঘোর অন্ধকারময়। আলোর দিশা দেখিয়ে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র এক ও একমাত্র সেই সদগুরু- (যিনি শিববাবা)। *আচ্ছা !*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে সতোপ্রধান বানিয়ে একরস স্থিতিতে কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। স্মরণের যাত্রার গুপ্ত পুরুষার্থ করতে হবে। একান্তে বসে জ্ঞানের পাঠ পড়তে হবে।

২) ঈশ্বরীয় বাবার থেকে মুক্তি-জীবনমুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা পাবার জন্য এই অন্তিম জন্মে তোমাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান :- সর্ব-প্রকার বিকারের সামান্য অংশকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া আত্মা নম্বর ওয়ান বিজয়ী হও

বিস্তার :- সম্পূর্ণ পবিত্র সে, যার মধ্যে অপবিত্রতার অংশ মাত্রও থাকে না। পবিত্রতাই ব্রাহ্মণ জীবনের বৈশিষ্ঠ্য। আর এই বৈশিষ্ঠ্যই সেবা কার্যে সহজ সফলতা আনে। কিন্তু যদি কোনও বিকারের সামান্যতম অংশও থেকে থাকে, তখন বিকারের অন্য সাথীও তার সাথে অবশ্যই যুক্ত হয়। যেমন, পবিত্রতার সাথে সুখ-শান্তি, তেমনি অপবিত্রতার সাথেও পাঁচ-বিকারের খুব গভীর সম্বন্ধ। এই কারণেই কোনও বিকারের সামান্যতম অংশও যদি না থাকে তার, তবেই সে নম্বর ওয়ান বিজয়ী হতে পারে।

স্লোগান :- হিম্মৎ সহকারে এক কদম রাখতে পারলেই, হাজার গুণ সাহায্য পাওয়া যায়।